পরিশিষ্ট

বিবর্তন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারনাগুলো

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তন সম্পর্কে ভ্রান্তির যেন কোন শেষ নেই। একটু খেয়াল করে দেখলে তার কারণটা বুঝে ওঠাও তেমন কঠিন নয়। বিবর্তনবাদ এমন একটি তত্ত্ব যা আমাদের মানব সভ্যতার হাজার বছর ধরে লালন করা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তার এবং তার চারদিকের 'সৃষ্টি' নিয়ে ভেবেছে, গান বেঁধেছে, গুহার গায়ে ছবি এঁকেছে, দার্শনিক আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে, কত রকমেরই না সৃষ্টিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে! মানব সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে তৈরি হাজারো রকমের সৃষ্টিতত্ত্বের অস্তিত্ব দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। নিজের উৎপত্তির রহস্যের কোন কূল কিনারা না পেয়ে এবং প্রকৃতির বিশালত্বের মাঝে নিজের অসহায়ত্বে দিশেহারা হয়ে মানুষ বিভিন্ন অলৌকিক সত্ত্বার কল্পণা করেছে; তেমনি আবার প্রকৃতির অন্যান্য জীবের সাথে তুলনা করে নিজের তথাকথিত 'মহিমায়' মুগ্ধ হয়ে সে নিজেকে বসিয়েছে সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে, নিজেই নিজেকে ভূষিত করেছে শ্রেষ্ঠ 'সৃষ্টি'র সম্মানে। এতো মহিমা, এত আয়োজন তার নিজেকে ঘিরে! সেখান থেকে হঠাৎ করে সাধারণ এই পৃথিবীর অতি সাধারণ সব জীবের স্তরে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে আসা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! আসলে বিবর্তনবাদ শুধু তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় মানুষের চিন্তা ভাবনা দর্শনের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটিয়েছে, তাকে খুব সহজে মেনে নেওয়া তো কঠিন হওয়ারই কথা। এটা সত্যি যে, জ্ঞান যেখানে আটকে গেছে সেখানে ভীড় করেছে আলৌকিকতা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি, কিন্তু সেখানেই তো সে থেমে থাকেনি। আবার যখন নতুন এবং পরিবর্ধিত জ্ঞানের আলোয় আগের অজানা বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে তখনই সে সব বাধা অতিক্রম করে পুরনো ভুলগুলোকে ভেঙ্গেচুরে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। তার এই কল্পনাশক্তি, সৃজনীশক্তি এবং তার সাথে যুক্তি দিয়ে বস্তুবাদী চিন্তা দিয়ে তার চারদিকের সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে দেখার অসীম ইচ্ছার কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আজকে এখানে এসে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। আজকে বিজ্ঞান এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Laws) দিয়েই সে তার পারিপার্শ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এই পৃথিবীতে প্রজাতির উদ্ভব এবং বিকাশ বোঝার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণবিহীন কোন অতিপ্রাকৃত সত্ত্বার আশ্রয় নেওয়ার আর দরকার নেই।

বিবর্তনবাদকে মেনে নিতে হলে আমাদের সনাতন বহু অন্ধ বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। খুব সহজবোধ্য কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আজ আমরা বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে এত বিরোধিতা ও ভুলভ্রান্তি দেখতে পাই। ছোটবেলা থেকে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের সব রকমের ব্যাখ্যা পড়ে-শুনে বড় হলেও বিবর্তনবাদের মত বিজ্ঞানের মূল একটি তত্ত্বকে আমাদের পাঠ্যসূচী থেকে সযতনে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর তার সাথে যদি যুক্ত হয় সুচিন্তিতভাবে আরোপ করা রাজনৈতিক, সামাজিক বিরোধিতা তাহলে তো আর কথাই নেই। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই যে শুধু বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না তা তো নয়, আমেরিকার মত অগ্রসর দেশেও আজকে বিবর্তনবাদের মত প্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই। আমরা আগেই দেখেছি যে, সে দেশের প্রেসিডেন্ট বুশ বিনা দ্বিধায় ঘোষণা দেন যে, "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" নামের এই পুরোন ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে যেনো বিবর্তনবাদের বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানের ক্লাসে পড়ানো হয়। আমেরিকার সংবিধান আনুযায়ী সরকারী স্কুল কলেজে ধর্ম বিষয়ক কোন রকম শিক্ষা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু তারপরও এভাবে তারা ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে স্কুল

কলেজের পাঠ্যসূচীতে ঢুকিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করে যাচ্ছেন। এ নিয়ে সচেতন জনগোষ্ঠী স্কুল বোর্ডগুলোর এধরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলাও করে ছাড়ছেন, এবং এখানকার বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সামাজিক সচেতনতার কারণে এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মামলার ফলই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের বিপক্ষে গেছে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তনবাদের বিরোধীতাটা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার তা নয়; এর পিছনে খুব শক্তিশালী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিও কাজ করছে। স্কুলের পাঠ্যসূচীতে এই সৃষ্টিতত্ত্বকে বিবর্তনের পাশাপাশি 'বিজ্ঞান' হিসেবে সৃষ্টিতত্ত্ব পড়ানোর দাবী তো আছেই, সেই সাথে আছে প্রচলিত পত্র পত্রিকা, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, প্রতিপত্তিশালী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিবর্তন সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচার করার অনবরত প্রচেষ্টা। বিজ্ঞানীরাও এখন অনেকে স্বীকার করেন যে, তারা শুধু এতদিন গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, সাধারণ মানুষকে বিবর্তন সম্বন্ধে অবগত করানোর বা বোঝানোর গুরুদায়িত্ব তাঁরা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এখন রিচার্ড ডকিন্স থেকে শুরু করে কেনেথ মিলার, টিম বেড়া, ডগলাস ফুটুইমা, আর্নেষ্ট মায়ার (প্রয়াত) মত বিখ্যাত জীববিজ্ঞানীরা কার্ল স্যাগানের পথ ধরে বিজ্ঞানকে বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

এটা সত্যি যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই বিবর্তনবাদেও এখনও অনেক অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই এখানেও বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বিষয় নিয়ে এখনও একমত হতে পারেননি। কিন্তু গত একশ বছর ধরে বিবর্তনবাদের মুল বিষয়বস্তু অর্থাৎ সব জীবই যে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই (descent, with modificatiom, of all organism from common ancestors)। আজকে পৃথিবীর গোলত্ব বা সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে - এগুলো যেমন প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবর্তনবাদও ঠিক তেমনি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

আসলে বিবর্তনবাদের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে আবার বিভিন্ন রকমের ভাগ এবং স্তর রয়েছে। এক্কেবারে গোঁড়ারা বিবর্তনবাদ তো দুরের কথা, এখনও বাইবেলের সেই সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাস করেন। অনেকে এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ছয় হাজার বছর আগেই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিলো এবং সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের ডায়নোসরের অস্তিত্ব আজগুবি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এরকম হাজার হাজার সাইট খুঁজে পাবেন। এই ধরণের ধর্মীয় মৌলবাদীরা পুরোপুরিভাবেই বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করেন। হারুন ইয়াহিয়া বলে তুর্কি এক স্বঘোষিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তার 'The Evolution Deceit' বইতে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে বিবর্তনবাদ আজকের পৃথিবীর আধিপত্যকারী শক্তির দ্বারা তৈরী একধরণের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে অনেকেই আছেন যারা বিজ্ঞানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, কিন্তু এখান থেকে সেখান থেকে শুনে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন। আমাদের দেশের স্কুল কলেজের বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে যেহেতু পরিস্কারভাবে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না তাই অনেকেই আবার ইন্টারনেটের সৃষ্টিতত্ত্ববাদী বিবর্তনবিরোধী সাইটগুলো থেকে তথ্য জোগার করে বেশ জোরেসোরে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে দেন। আসলে বিবর্তনতত্ত্ব হচ্ছে জীববিদ্যার সব শাখার অন্যতম ভিত্তিমুল, একে ছাড়া জীববিদ্যাই অচল হয়ে পড়বে। বাজারে বিবর্নতবাদের উপর পৃথিবীর নাম করা সব বিজ্ঞানীদের লেখা হাজারো বই রয়েছে, তাদের কোন একটি বই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই কিন্তু বেশীর ভাগ ভুল ধারণাগুলো কেটে যায়, কিন্তু এতটুকু কষ্টই বোধ হয় অনেকের আর করে ওঠা হয় না। মজার জিনিস

হচ্ছে, ডারউইন এবং ওয়ালেস বিবর্তন তত্ত্বটি প্রকাশ করার পর বেশীরভাগ মানুষই এর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু গত দেড়শ বছরে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এখন আর পুরোপুরিভাবে কেউ একে অস্বীকার করতে পারেন না। তাই যারা এ সম্পর্কে অল্পসল্প খবর রাখেন তারা অনেকেই বলেন যে মাইক্রো-বিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে তবে ম্যাক্রো-বিবর্তন নাকি একটি অসম্ভব ব্যাপার। চলুন তাহলে এখন বিবর্তনবাদ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা এবং প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১) বিবর্তনবাদ শুধুই একটি তত্ত্ব (Theory) এর মধ্যে কোন বাস্তবতা বা সত্যতা (Fact) নেইঃ

এই ধরণের কথা যারা বলেন তাদের কাছে বোধ হয় তত্ত্ব এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক পরিষ্কার নয়। চলুন প্রথমে না হয় সেটাই একটু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা যাক। কোন পর্যবেক্ষণ যখন বারংবার বিভিন্ন ভাবে প্রমাণিত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তবতা বা সত্য (fact) বলে ধরে নেই। আর এদিকে তত্ত্ব হচ্ছে এই বাস্তবতা বা পরীক্ষিত কোন অনুকল্প কিভাবে ঘটছে সেই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা। যেমন ধরুন, আপেল কেন মাটিতে পড়ে- তা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে তা খুব ভালভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে আপেল পড়ার ব্যাপারটা হচ্ছে বাস্তবতা। আর নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র যা দিয়ে এই আপেল পড়ার প্রক্রিয়াটাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তা হল তত্ত্ব। দেখা গেল এই মহাকর্ষ তত্ত্ব খুব ভালভাবেই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু আইনস্টাইন এসে দেখালেন যে নিউটনের মহাকর্ষ নিয়ম কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক ফল দেয় না। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে কখন? যখন বস্তু কণা ছুটতে থাকে আলোর বেগের কাছাকাছি কিংবা যে সমস্ত জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব খুব বেশী (যেমন ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি)। দেখা গেল যে, এ সমস্ত পরিস্থিতিতে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের চেয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব (General theory of relativity) আরও নিঁখুত ফলাফল দেয়। শুধু তো তাই নয়, এইতো সেই দিন বহুলভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানের সাময়িকী Disccover এর আগষ্ট ২০০৬ সংখ্যায় দেখলাম মোর্দেহাই মিলগ্রম (Mordehai Milgrom) নামের এক বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের তত্ত্বকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন, কারণ মোর্দেহাইয়ের তত্ত্বে সেই রহস্যময় 'ডার্ক ম্যাটার' এর ধারণা গ্রহণ করার দরকার পড়ে না। তাহলে কি আমরা বলবো, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিউটনের (বা আইনস্টাইনও যদি কখনও ভুল প্রমাণিত হয়) মহাকর্ষের সুত্রকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বিধায় গাছ থেকে আপেল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি আপেলগুলো গাছের ডাল এবং মাটির মাঝামাঝি শুন্যে ঝুলে রয়েছে? আপেলের পতন তো আর নিউটন বা আইনস্টাইনের তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে নেই। বিজ্ঞান তো স্থবির নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া সাক্ষ্যগুলোর চুলচেরা ক্রস-বিশ্লেষণের পরেই এরকম তত্ত্বগুলো হাজির করা হয়। যে তত্ত্বটি সবচেয়ে ভালভাবে বাস্তবতাকে (Reality) এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছে সেই তত্ত্বটিকেই গ্রহণ করা হয়। তার পরও যদি দেখা যায় যে, এর চেয়ে আরও ভালো বিশ্লেষণ পরবর্তীতেপাওয়া যাচ্ছে, তখন বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ীই যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞান এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যায়, নতুন নতুন এবং উন্নততর তত্ত্বের মাধ্যমে বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমের বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। এদিকে আবার কিছু বাস্তবতা বা সত্য আছে যা চোখের সামনে সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিবারই তাকে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা সম্ভব, যেমন ধরুন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, বা অণু পরমাণুর গঠন ইত্যাদি, কিন্তু এরা যে বাস্তব তা নিয়ে তো সন্দেহর কোন অবকাশ নেই।

বিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য। এটি একটি বাস্তবতা যে, জীব স্থির নয় বরং বিবর্তনের মাধ্যমে

তাদের পরিবর্তন ঘটে আসছে, তাদের কাউকেই পৃথক পৃথকভাবে তৈরী করা হয়নি, তারা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে। এই বাস্তবতাটি গত দেড়শো বছর ধরে বারবার হাজারো রকমভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আগের অধ্যায়গুলোতে এই প্রমাণগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিবর্তন ঘটছে, কোন তত্ত্বের মাধ্যমে এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সবচেয়ে পূর্ণাংগভাবে প্রমাণ করা যাবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও বিতর্ক চলছে। ডারউইন নিজেও এই দু'টো বিষয়কে আলাদা করে উপস্থাপন করেছিলেন। 'The Descent Of Man' বইতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, এখানে তিনি দু'টো পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। প্রথমটি হচ্ছে যে কোন প্রজাতিকেই পৃথকভাবে তৈরি করা হয়নি, প্রকৃতিতে বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে আর দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানতঃ এই পরিবর্তনগুলো ঘটে থাকে। তিনি এই বলেও সাবধান করে দেন যে, যদি তিনি ভুলবশতঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর অত্যাধিক জোর দিয়েও থাকেন তবু তার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে এটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে, প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টির মতবাদটি অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয় [২]। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা দাবী করেন যে, যেহেতু বিজ্ঞানীরা নিজেরাই এখনও বিবর্তন নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে যাচ্ছেন তা থেকে নাকি প্রমাণিত হয় বিবর্তনবাদের কোন ভিত্তি নেই। আবারও, একই কথা বলতে হয় এর উত্তরে। বিজ্ঞানীরা বিবর্তন কিভাবে ঘটছে অর্থাৎ বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিবর্তনবাদের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ 'বিবর্তন আদৌ ঘটছে কিনা' তা নিয়ে একবারও সন্দেহ প্রকাশ করেন না। কারণ বিবর্তনের বাস্তবতা অনেক আগেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এখন বিতর্ক চলেছে বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে। যেমন ধরুন, প্রাকৃতিক নির্বাচন যে বিবর্তনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া তা নিয়ে কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটিই কি একমাত্র বা প্রধানতম কারণ নাকি এমন অনেক জেনেটিক বা বংশগতীয় পরিবর্তন থাকতে পারে যারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতাভুক্ত না হয়েই বিবর্তন ঘটাতে পারে, কিংবা আসলেই কি বিবর্তন শুধুমাত্র ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে নাকি কোন কোন সময় তার এই গতিতে উল্লম্ফনও ঘটতে পারে। বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে বিচার করলে এই বিতর্কগুলোকে অত্যন্ত সুস্থ এবং বৈজ্ঞানিক বলেই ধরে নিতে হবে। এর মাধ্যমেই হয়তো একদিন আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারবো ঠিক কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তন ঘটছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা যখন একে পুঁজি করে বিবর্তনবাদের দূর্বলতা খুঁজতে থাকেন তখন তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না।

২) প্রকৃতিতে মাইক্রো-বিবর্তন ঘটতে দেখা গেলেও ম্যাক্রো-বিবর্তন ঘটার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাঃ

এই (কু)যুক্তিটি বিবর্তনবাদের বিরোধীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তারা সুযোগ পেলেই এই ব্যাপারটাকে সামনে নিয়ে আসেন। শুধুমাত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এটা বলেন বললে বোধ হয় পুরোটা বলা হয় না। ম্যাক্রো-বিবর্তনের ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে ওঠার জন্য বিবর্তনবাদের গভীরে যতটুকু ঢোকা দরকার সেটা তারা করেন না, কিন্তু তারা জানেন যে, ম্যাক্রো-বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বসুরী প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে হাজার, লক্ষ, কোটি বছর লেগে যেতে পারে। এ তো আর চোখের সামনে ঘটতে দেখা যায় না, তাই এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব সহজেই সংশয় সৃষ্টি করা সম্ভব - আর সেটারই সুযোগ নেন তারা। প্রজাতির সংজ্ঞা কি? বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রজাতি হচ্ছে এমন এক জীবসমষ্টি যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম, তারা অন্য প্রজাতির সাথে প্রজননগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা 'চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন' অধ্যায়ে উদ্ভিদের মধ্যে বেশ অল্প সময়েই এ ধরণের নতুন প্রজাতি উৎপন্ন হতে দেখেছি, রিং বা চক্রাকার প্রজাতির মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে

নতুন ধরণের প্রজাতি তৈরী থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রজাতি তৈরীর উদাহরণও দেখেছি। এখন বিবর্তনবাদের বিরোধীরা বলতে শুরু করবেন, এই সব ক্ষেত্রেই তো এক ধরণের উদ্ভিদ থেকে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ বা টিকটিকি থেকে আরেক ধরণের টিকটিকিই তৈরী হচ্ছে, এমন তো নয় যে বানর থেকে মানুষ বা ডায়নোসর থেকে পাখি বা জলহস্তীর মত স্থলচর জীব থেকে সমুদ্রের দৈত্যাকার মাছ তিমি উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে - যে ধরণের ব্যাপার স্যাপারগুলো বিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে বলে বিজ্ঞানীরা দাবী করেন। হুমমম্, অবশ্যই একটি যৌক্তিক প্রশ্ন। বিবর্তনবাদের পিছনে যে বিজ্ঞান কাজ করছে তা বুঝলে প্রশ্নটার উত্তর একটু কঠিন হলেও অবোধ্য হওয়ার কথা নয়। বিভিন্ন সময় আগের অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়গুলো নিয়ে বারবার আলাপ করা হলেও তাদেরকে একসাথে করে বিস্তারিতভাবে না হয় আরেকবার প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া যাক। আগের লেখায় বিবর্তনের তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি, এখন আর বেশী তত্ত্ব কথায় না গিয়ে কিছু উদাহরণ, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে যে রাতারাতি ঘটে যাওয়া নাটকীয় কোন চটকদার পরিবর্তনের ধারণা বিবর্তনের তত্ত্বে জায়গা পায়নি। আগেই দেখেছি আমরা যে, বিবর্তন ঘটে অত্যন্ত মন্থর গতিতে, প্রাকৃতিক নির্বাচন, মিউটেশন, জেনেটিক ড্রিফট, ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, বংশীয় বা জেনেটিক রিকম্বিনেশন সহ বিভিন্ন কারণে প্রজাতির মধ্যে ছোট ছোট পরিবর্তন বা মাইক্রো-বিবর্তন ঘটতে থাকে। আর বহু মাইক্রো-বিবর্তনের মাধ্যমে ঘটা সম্মিলিত পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে একসময় প্রজাতি বা প্রজাতিটির একটি অংশ অন্য আরেকটি প্রজাতিতে পরিণত হয়। অনেক বিজ্ঞানী বিবর্তনে উল্লম্ফন এবং মেগাবিবর্তনের কথা বলেন, এই উল্লম্ফনগুলোও এক প্রজন্মে ঘটে না, বিশেষ কোন সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে (যেমন, আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা পরিবেশগত পরিবর্তন) লক্ষ লক্ষ বছরের জায়গায় হয়তো হাজার হাজার বছর লাগে এই 'তড়িৎ' বিবর্তনগুলো ঘটতে। ব্যাপারটা এমন নয় যে একদিন সকালে উঠে দেখা গেলো যে, বনমানুষ থেকে এক মানব শিশু জন্ম নিয়ে ফেলেছে এবং সবাই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাচ্ছে। যেমন ধরুন এক ধরণের বন-মানুষ থেকে প্রায় ৮০-৪০ লক্ষ বছর আগে যখন মানুষের পুর্বপুরুষদের বিবর্তন ঘটতে শুরু করে তখন খুব ধীরে হাজার হাজার বছরের বহু ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শুরু করে এবং সেই সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে তাদের মস্তিষ্কের আকারও বড় হতে শুরু করে। প্রায় ৫৫-৩০ লক্ষ বছর আগের মানুষের পুর্বপুরুষদের যে অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, কিভাবে সময়ের সাথে সাথে ক্রমশঃ বনমানুষের চারপায়ী বৈশিষ্ট্যগুলো বদলে যাচ্ছে এবং ফসিলগুলো যত আধুনিক সময়ের দিকে এগিয়ে আসছে ততই আরও বেশী করে আমাদের মানুষের মত হয়ে উঠছে। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো এতই ধীরে ধীরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঘটেছে যে কোন এক প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে তা বোঝার কোন উপায় থাকে না। সেই সময়ে আরেক গ্রহ থেকে কোন এক বুদ্ধিমান প্রাণী এসে এই পূর্বপুরুষদের দেখলে অবাক হয়ে বলতো না, 'ও আচ্ছা ওরা তো দেখছি অর্ধেক মানুষে পরিণত হয়ে বসে আছে, এখনও গাছেও ঝুলছে, দু'পায়ের উপর ভর করে মাটিতেও হাঁটতে শিখেছে, মস্তিষ্কের আকারও আগের চেয়ে বড় হয়েছে, পূর্ণাংগ মানুষ হতে তো ওদের আরও কয়েক লক্ষ বছর লেগে যাবে'! যখন যে প্রজাতি যে অবস্থায় থাকে সেটাই তার পুর্নাংগ রূপ, সেই সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওই বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। অতীতের দিকে তাকিয়ে, আমরা কয়েক লক্ষ বা কোটি বছরে বিবর্তিত হতে থাকা প্রাণীদের ফসিল রেকর্ড দেখে যেভাবে মধ্যবর্তী প্রজাতি বলে সনাক্ত করতে পারি, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে তা বোঝার কোন উপায় থাকে না, এই মধ্যবর্তী প্রজাতির ধারণাটি এখানে সম্পুর্নভাবে আপেক্ষিক। এভাবে চিন্তা করলে একদিকে যেমন বলা যায় মধ্যবর্তী ফসিল বলে কিছু নেই আবার উল্টোভাবে সেই আদি জীবের উদ্ভবের পর সবাই আসলে কারও না কারও মধ্যবর্তী জীব। সব

উভচর প্রাণী মাছ এবং সরীসৃপের মধ্যবর্তী অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, আবার ওদিকে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা উভচর এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাঝখানের অবস্থা ধারণ করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে আবিষ্কার করেছেন যে গত কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের মস্তিষ্ক ক্রমাগতভাবে আরও বড় হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা এখনও বিবর্তিত হচ্ছি, তার মানে তো এই নয় যে আমরা কোন মধ্যবর্তী অবস্থায় আটকে আছি। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স তার 'The Ancestor's Tale' বইতে বেশ মজা করেই বলেছেন, এই যে আমরা প্রায়ই প্রশ্ন করি 'মানুষের প্রথম পুর্বপূরুষ কে ছিলো' - এটা আসলে বোকার মত একটা প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, অত্যন্ত ধীরগতিতে ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকা বিবর্তনের প্রক্রিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে এই ধরণের প্রশ্নগুলোর আসলে কোন অর্থই হয় না। বিবর্তনের দৃষ্টিতে অর্থপূর্ণভাবে প্রশ্ন করতে হলে এভাবে হয়তো জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, 'মানুষের সবচেয়ে আগের কোন পূর্বপুরুষ বা পূর্বপুরুষরা স্বাভাবিকভাবে দুই পায়ের উপর হাটতে শিখেছিলো?' বা 'আমাদের কোন পূর্বপুরুষের মস্তিষ্কের আকার ৬০০ সিসির চেয়ে বড় ছিলো?' [৩]।

কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে এই পরিবর্তন তো চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে বিজ্ঞানীরা কি করে বলছেন যে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি আসলেই ঘটেছিলো? বিজ্ঞানের সব তত্ত্বই তো শুধু চোখের সামনে দেখে প্রমাণ করা হয় না। তাহলে তো ভূতত্ত্ববিদ্যার প্লেট টেকটনিক্স, মহাদেশীয় সঞ্চরণ থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যার পরমাণুর গঠন বা বিগ ব্যাং এর মত সব তত্ত্বকেই আজকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রজাতির উদ্ভব বা জীবের ম্যাক্রো-পরিবর্তনের তত্ত্বটি আজকে ফসিল রেকর্ড ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের এত শাখার সাহায্যে এত উপায়ে পরীক্ষিত যে, যারা এ নিয়ে এখনও সন্দেহ করেন তাদের পায়ের নীচে মাটি নেই বললেই চলে। পানির মাছ থেকে স্থলচর চারপায়ী প্রাণীর বিবর্তন কিংবা সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের প্রত্যেকটি ধারাবাহিক ধাপের একটি দুটি নয় বরং অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে[৪], যেমন ধরুন, স্তন্যপায়ী প্রাণীর উত্তরসূরী সরীসৃপের নীচের চোয়ালে পাঁচটি পৃথক পৃথক হাড় রয়েছে, কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোয়ালে রয়েছে মাত্র একটি হাড়। সরীসৃপের চোয়ালের হাড়গুলো ধাপে ধাপে কমতে শুরু করে এবং ফসিল রেকর্ড থেকে আজকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে পাই কিভাবে তা স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের হাড়ে রূপান্তরিত হয়েছিলো। এই ধাপে ধাপে পরিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে ফসিলবিদেরা একাধিক 'মাঝামাঝি' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ট্রায়াসিক যুগের তথাকথিত 'স্তন্যপায়ী জাতীয় সরীসৃপ' প্রাণীর ফসিল খুঁজে পেয়েছেন। এদের মধ্যে এই বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপের দুটি স্তরই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যায়[২], এদের রয়েছে দু'টো চোয়ালের জয়েন্টঃ একটি হচ্ছে ক্রমশঃ ছোট হতে থাকা সরীসৃপের চোয়াল আরেকটি হচ্ছে নতুন ধরণের চোয়াল। পরবর্তীতে ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকে দেখা যায় যে, সরীসৃপের চোয়ালটির কাজ ধীরে ধীরে বদলে কানের হাড়ে পরিণত হচ্ছে । আজ পর্যন্ত আমরা এই বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছি, একারণেই কিছু চিবানোর সময় আমরা কানের ভিতরে চোয়ালের হাড়ের নাড়াচাড়া আনুভব করতে পারি। এই প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর হাজারো বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ সহ শ'য়ে শ'য়ে বই লেখা হয়েছে। এ 'Vertebrate Evolution' বা 'Evolution of Mammals' লিখে www.amazon.com নামের অনলাইন বইয়ের সাইটে সার্চ দিলেই এই সব বিষয়ের উপর গবেষণারত বিজ্ঞানীদের লেখা গাদি গাদি বইয়ের নাম বেরিয়ে পড়বে।

এটা কি একটা শুধুই কাকতলীয় ব্যাপার যে, ফসিল রেকর্ডে উভচর প্রাণীর উৎপত্তির আগে কোন সরীসৃপের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, বা সরীসৃপের আগে কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল খুঁজে পাওয়া যায় না? এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে যে, এখন পর্যন্ত এমন কোন স্তরে এমন একটি অদ্ভুত ফসিল পাওয়া যায়নি যা দিয়ে বিবর্তন তত্ত্বের ধারাবাহিকতাকে ভুল প্রমাণ করা যায়। আজকে বিজ্ঞানীরা বলছেন

মানুষ এক ধরণের বনমানুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে, এখন যদি দেখা যায় বন মানুষ জাতীয় প্রাইমেট তো দুরের কথা স্তন্যপায়ী প্রাণী উৎপন্ন হওয়ার অনেক আগে সেই ক্যামব্রিয়ান যুগেই মানুষের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে, তাহলেই তো বিবর্তনের তত্ত্ব ভেঙ্গে পড়ার কথা। যারা বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করেন তাদের একবার ভেবে দেখা দরকার কেনো আজ পর্যন্ত যত হাজার হাজার ফসিল পাওয়া গেছে তার একটিও ভুল স্তরে পাওয়া যায়নি! এক কোষী প্রাণী, বহু কোষী প্রাণী, মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ফসিলগুলো তাদের বিবর্তনের ধারাবাহিক স্তর ছাড়া অন্য পূর্ববর্তী কোন স্তরে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে না কেনো। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী হ্যালডেন একবার বলেছিলেন কেউ যদি প্রিক্যামব্রিয়ান স্তরে একটি খরগোশের ফসিল খুঁজে পায় তাহলে তিনি বিবর্তনবাদে আর আস্থা রাখবেন না। আমি 'মিসিং লিঙ্কগুলো আর মিসিং নেই' অধ্যায়ে পাখি, তিমি মাছ, মানুষ এবং চারপায়ী স্থলচর প্রাণীদের মধ্যেবর্তী ফসিলগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। স্থলচর প্রাণী থেকে পানিতে অভিযোজিত হয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের প্রজাতি তিমি মাছে পরিণত হওয়ার বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছি সেখানে। এই তিমির বিবর্তনটা বেশ গোলমেলে, বিজ্ঞানীরা প্রায় কয়েকশো বছর ধরে ব্যাপারটা নিয়ে হিমশিম খেয়ে শেষ পর্যন্ত খুব সাম্প্রতিককালে রহস্যটার কুলকিনারা করতে পেরেছেন। ব্যাপারটা যেহেতু বেশ একটু অন্যরকম তাই ম্যাক্রো-বিবর্তনের উদাহরণ হিসেবে এখানে এটাকেই বেছে নিচ্ছি বিস্তারিত আলোচনার জন্য। দেখা যাক তাহলে এই বৈজ্ঞানিক আবিস্কারটির পিছনে কতগুলো ছিলো বিজ্ঞানীদের কল্পনার তুলিতে আঁকা ছবি এবং মনগড়া ব্যাখ্যা আর কতগুলো এসেছিলো ফসিল রেকর্ড, জেনেটিক্স বা আণবিক জীববিজ্ঞানের মত বিজ্ঞানের আধুনিক শাখাগুলো থেকে পাওয়া প্রমাণগুলোর অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে।

এই বিশাল বপুর তিমি 'মাছ'গুলো বেশ অদ্ভুত। আমরা আর সব মাছের মতই এই গভীর সমুদ্রে বাস করা প্রাণীটাকে 'মাছ'ই বলি কিন্তু এদের সাথে মাছের বৈশিষ্ট্যের মিল খুব কম বললেই চলে। সেই ১৬৯৩ সালে ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ জন রে তিমিকে ডাঙ্গার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সাথে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, ডারউইনের আগের বিজ্ঞানীরা ভেবে কুল কিনারা পাননি এই তিমিগুলো কি স্তন্যপায়ী প্রাণীর পুর্বপুরুষ নাকি তারা তাদের উত্তরসুরী! ডারউইন যখন বললেন যে তিমিগুলো ভালুকের মত কোন প্রাণী থেকে বিবর্তিত হলেও তিনি অবাক হবেন না তখন এটি নিয়ে এমনই হাসাহাসি করা হয়েছিল যে, তিনি তার Origin of species বই এর পরের সংস্করণ থেকে তা বাদই দিয়ে দিয়েছিলেন [৫]। এর পরেও বিভিন্ন বিজ্ঞানী তিমি মাছের বিবর্তন নিয়ে হিমসিম খেয়েছেন, তাদের শরীরের বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলো যে তাদের মাটি থেকে পানিতে বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে তা তো বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তিমির দেহে এখনও রয়ে গেছে পাঁজরের এবং পায়ের হাড়ের অংশবিশেষ, তাদের কানের পাশে এখনও বেশ কয়েকটি মাংশপেশী রয়ে গেছে যেগুলো শুধুমাত্র কান নাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হতে পারে (কিছু কিছু স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী তা করে থাকে) , বেলুগা জাতের তিমিতে এখনও লুপ্তপ্রায় বহির্কর্ণের অংশ রয়ে গেছে যেগুলো গভীর সমুদ্রে বাস করা জীবের কোন কাজেই আসতে পারে না [১১]। ১৯৪৫ সালে জর্জ গেলর্ড সিম্পসন লিখেছিলেন যে, এই তিমিরা হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত এবং তার জানা ফসিল রেকর্ড থেকে তিমির উৎপত্তি এবং শ্রেনীবিভাগ করা একধরণের অসম্ভবই বলতে হবে [৬]। কিন্তু এর পরপরই ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীরা জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষা করে জানালেন যে, তারা সেরাম প্রোটিনের তুলনামুলক পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে Cetacea জাতের অন্তর্ভুক্ত তিমি মাছের সাথে Artiodactyla (এই অর্ডার বা বর্গের মধ্যে জোড়া সংখ্যক আঙ্গুল বিশিষ্ট গরু, হরিণ, জলহস্তী ইত্যাদি রয়েছে) জাতের প্রাণীদের সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য রয়েছে [৬]। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ভ্যান ভ্যালেন আবার তিমিকে mesonychid condylarths নামক বিলুপ্ত এক মাংশাসী স্তন্যপায়ী প্রাণীর উত্তরসুরী বলে সনাক্ত করেন। ৭০ এর দশকে আমেরিকান ফসিলবিদ ডঃ ফিলিপ গিঙ্গরিচ (Philip D. Gingerich)

এবং তার দল তিমির পুর্বপুরুষের বেশ কয়েকটি প্রাচীন ফসিল খুঁজে পান মিশর এবং পাকিস্তানে [৯]। প্রায় পাঁচ কোটি বছরের পুরনো *Pakicetus* নামক (তিমির বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের ছবিগুলোর জন্য 'মিসিং লিঙ্কগুলো আর মিসিং নেই' অধ্যায়টি দেখুন) এক ধরণের স্থলচরী স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায় যার কানের হাড় গুলো তিমির মত হলেও করোটিটি দেখতে কুকুর জাতীয় প্রাণীর মত। তারপর তারা আরেকটু পরের সময়েয় ফসিল খুঁজে পেলেন যার পায়ের পাতা হাসের পায়ের পাতার মত ছড়ানো, কিন্তু পাগুলো তখনও হাটা বা সাতারের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তারা মজা করে এর নাম দিয়েছিলেন 'Walking and swimming whale'। তারপর পাওয়া গেলো পরবর্তী স্তরের প্রাণী *Rodhocetus* -এর ফসিল, যারা ইতোমধ্যেই পানিতে সম্পুর্ণভাবে অভিযোজিত হয়ে গেছে, এদের নাকের ছিদ্র সরে গেছে অনেক পিছনে (আধুনিক তিমির মত তার পিঠের যে ছিদ্র থেকে পানি উৎক্ষেপন করে তার প্রায় অর্ধেক পথ দুরে), পাগুলো হয়ে গেছে অনেকটা ফ্লিপারের মত। তিমির বিবর্তনের ধারাবাহিকতার চিত্রটি যেনো ফুটে উঠতে শুরু করেছে চোখের সামনে। ফিলিপ গিঙ্গরিচ-এর দল তখন ভাবছেন আর কয়েকটি ফসিল পেলেই তারা প্রমাণ করে ফেলতে পারবেন যে তিমি আসলেই mesonychid থেকেই বিবর্তিত হয়েছে [৭, ৯]।

কিন্তু এর মধ্যে আবার আণবিক জীববিদেরা ডিএনএ সংকরায়ন এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকে জানালেন যে, মাংশাসী mesonychid নয় বরং ক্ষুরবিশিষ্ট তৃণভোজী Artiodactyla দের সাথেই তিমির সবচেয়ে বেশী জেনেটিক সাদৃশ্য আছে বলে মনে হচ্ছে। গিঙ্গরিচ-এর দল তখন আবার ফিরে গেলেন পাকিস্তানের নতুন এক জায়গায় আরও নতুন ফসিল আবিষ্কারের আশায়। শেষ পর্যন্ত বহুদিনের গবেষণার পর তাঁরা *Artiocetus clavis* এবং *Rodhocetus balochistanensis*-এর বিভিন্ন ফসিল খুঁজে পেলেন যাদের কঙ্কাল, গোড়ালীর হাড় এবং জয়েন্ট এবং করোটি থেকে বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে যে তিমির পুর্বপুরুষেরা আসলে তৃণভোজী ক্ষুরবিশিষ্ট জলহস্তীর পুর্বপুরুষ থেকেই বিবর্তিত হয়েছিলো। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আধুনিক তিমির পাঁচটি মধ্যবর্তী স্তর খুঁজে পেয়েছেনঃ তার মধ্যে *Rodhocetus* (এবং *Artiocetus*)-এর বেশ কয়েকটি প্রায়-সম্পূর্ণ ফসিল পাওয়া গেছে, *Basilosaurus* এবং *Doruden*-এরও একাধিক সম্পূর্ণ ফসিল পাওয়া গেছে [৭]। বিজ্ঞানীরা কয়েক দশকের গবেষণার পর তিমির ম্যাক্রো-বিবর্তন নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে শুরু করেছেন, এর পিছনে যে অক্লান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ক্রস পরীক্ষা, তথ্য এবং সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে তা জানলে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। ফিলিপ গিঙ্গরিচ Paleobiology, জার্নালের ২০০৩ সালের ২৯.৩ সংস্করণে প্রকাশিত রিসার্চ পেপারে তার আবিষ্কার এবং সেই সাথে অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের বিস্তারিত বর্ণনা করে যে উপসংহার টানেন, তা আমি এখানে ইংরেজীতে হুবহু তুলে দিচ্ছিঃ "The fossils we know well support the idea of a unidirectional trend of increasing aquatic adaptation through *Rodhocetus* and *Dorudon* stages of whale evolution. However, superimposed on this is simultaneous change in locomotor adaptation involving a distinct reversal of specialization, from hindlimb-dominated swimming in *Rodhocetus*, to lumbusand tail-dominated swimming in *Dorudon.* Thus the overall pattern is neither simple nor direct. It is common to see microevolutionary histories zig-zag back and forth through time as they reverse themselves to track changing opportunities, and the land-to-sea transition of early whales provides a macroevolutionary example." [৮]

এবার চোখ ফেরানো যাক জীববিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো যেমন, আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স জিনোমিক্স থেকে ম্যাক্রো-বিবর্তনের পক্ষে পাওয়া প্রমাণগুলোর দিকে। আজকে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর

সম্পুর্ণ জিনোম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ‘The great tree of life’-এর ধারণা কোন মনগড়া ক্ষ্যাপা বিজ্ঞানীর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসুত গল্প নয়। ডারউইন তার সময়ের থেকে বেশ অনেকটা এগিয়ে থেকে সমস্ত জীবকুল যে একই আদি জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলে অনুকল্প দিয়েছিলেন তা আজকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের কল্যাণে সুপ্রিতিস্ঠিত একটি তত্ত্ব। আগে ফসিল রেকর্ড এবং জীবের বাহ্যিক বৈশিস্ট্যগুলো দেখে প্রাণের শ্রেণিবিভাগ করতে হত, এখন তা ক্রস পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া স্বতন্ত্র তথ্যের মাধ্যমে। এটা এখন প্রমাণিত যে, বিবর্তনের সম্পর্কে এবং ধারাবাহিকতায় যে জীব যত অন্য জীবের কাছের সময়ের ততই তাদের মধ্যে ডিএনএ, আরএনএ বা প্রোটিনের সাদৃশ্য বেশী। কয়েকশো’ বছর ধরে পাওয়া ফসিল রেকর্ডের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে! আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ঘাস, উদ্ভিদ থেকে শুরু করে কৃমি, পাখী, মাছ, মানুষ পর্যন্ত সবাই একই জটিল আণবিক মেশিন বা গঠন বহণ করে চলেছে, জীবনের ডিএনএ, আর এন এ কোড, প্রোটিন সিন্থেসিস-এর প্রক্রিয়া এবং শক্তি সঞ্চলনের এ টি পি (ATP) ব্যবস্থাও তাদের এক। মানুষ, শিম্পাঞ্জী, ইঁদুর, সহ বিভিন্ন প্রাণীর জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে, আরও অনেক প্রাণীর জিন পড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে। খুব সাম্প্রতিককালের আধুনিক জেনেটিক গবেষণা [১০] থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জীর জিনের সাথে আমাদের জিন ৯৯% মিলে যাচ্ছে আর ডিএনএ-এর সন্নিবেশ এবং মুছে যাওয়া (DNA insertion and deletion) ধরলে এই মিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬%। মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জীর যে পার্থক্য তার চেয়ে মানুষের সাথে ইঁদুরের পার্থক্য ৬০% বেশী। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের ডিএনএ-এর গড়পরতা যে মিল তার চেয়ে একটা শিম্পাঞ্জীর সাথে একটা মানুষের মিলের পরিমাণ মাত্র ১০% কম। এমনি পার্থক্য একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারাইটিদের মধ্যেও দেখা যায়। তাই মানুষকে অনেকে বলেন ‘তৃতীয় শিম্পাঞ্জী’। মানুষ এবং শিম্পাঞ্জী যে প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগে একই পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো তা নিয়ে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই [১১]।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জীবের বংশানুসৃত দ্রব্য ডিএনএ এবং আরএনএ এবং প্রোটিনের অনুগুলোর আনবিক গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাদের আণবিক গঠনও একই রকমের। যেমন প্রকৃতিতে ৩২০ রকমের এমাইনো এসিড পাওয়া গেলেও দেখা গেছে প্রতিটি জীব গঠিত হয়েছে মাত্র ২০টি এমাইনো এসিডের রকমফেরে। অর্থাৎ একই রকমের (২০টি) এমাইনো এসিড দিয়ে সকল জীবের প্রোটিন গঠিত। প্রোটিন অণুতে এমাইনো এসিডের আবশেষগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে বলে এমাইনো এসিড অনুক্রম। ঠিক একই রকমভাবে দেখা গেছে যে, সকল জীবের ডিএনএ অনুর গঠন একক বেসও একই ধরনের। মাত্র চার প্রকার বেস (এডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন) দিয়ে সকল জীবের ডিএনএ গঠিত। প্রতি বছরই প্রকৃতিতে প্রায় হাজার খানেক করে নতুন প্রজাতির সন্ধান পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। প্রতিদিনই নতুন নতুন ডিএনএ এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ করছেন তারা ল্যাবরেটরীতে বসে। একটি ক্ষেত্রেও তারা ব্যতিক্রম পাননি। এখান থেকে বোঝা যায় যে, সকল জীবের উৎপত্তি যদি একই উৎস থেকে বিবর্তিত না হয়ে থাকে তবে আধুনিক জীববিদ্যার এ সমস্ত তথ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে, জীবের উৎপত্তি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় - তা সে মানুষই হোক অথবা বিশাল বপু হিপোপটেমাসই হোক - সকলেই একই উৎসের ধারাবাহিক বিবর্তনের ফসল। ওদিকে আবার আনবিক জীববিদ্যা খুব ভাল ভাবে দেখিয়েছে যে প্রোটিনে এমাইনো এসিডের অনুক্রমে পরিবর্তনের কারণ ডিএনএ জেনেটিক কোডে মিউটেশন। মিউটেশনের হারও নানাভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন প্রোটিনের এমাইনো এসিড অনুক্রম ও নিউক্লিয়িক এসিডে পলিনিউক্লিয়োটাইড অনুক্রম বিশ্লেষণ করে যথাক্রমে এমাইনো এসিড আর বেসের প্রতিস্থাপন হিসেব করে মিউটেশনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। দেখা গেছে সমগ্র জীব জগতে গড়ে ১৭.৬

মিলিয়ন বছরে একটি এমাইনো এসিড প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ৭৯২ মিলিয়ন বছর আগে। এ হিসেবটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের হিসেবের সাথে অবিকল মিলে যায়। সরিসৃপ এবং স্তন্যপায়ীদের 'সাইটোক্রোম সি' অণুর মধ্যে এমাইনো এসিডের গড় পার্থক্য থেকে হিসেব করে বের করা হয়েছে যে এ দুটি গ্রুপের পৃথক হতে সময় লেগেছে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছর। ঠিক একই ভাবে শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং ও মানুষ বিবর্তনের ধারায় কখন একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে তাও খুব নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

ম্যাক্রোবিবর্তনের পক্ষে আরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে রক্তরস বিজ্ঞান থেকে। রক্তকে জমাটবদ্ধ হতে দিলে যে তরল পদার্থ পৃথক হয়ে আসে তার নাম সিরাম (serum)। এতে থাকে এন্টিজেন। এ সিরাম এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে প্রবেশ করালে উৎপন্ন হয় এন্টিবডি (antibodies)। যেমন মানুষের সিরাম খরগোশের দেহে প্রবেশ করালে উৎপন্ন হয় এন্টি হিউম্যান সিরাম। এতে থাকে এন্টি হিউম্যান এন্টিজেন। এ এন্টিহিউম্যান সিরাম অন্য মানুষের সিরামের সাথে মেশালে এন্টিজেন এবং এন্টিবডি বিক্রিয়া করে অধঃক্ষেপ বা তলানি উৎপন্ন হয়। এই অ্যান্টি হিউম্যান সিরাম নরবানর, 'পুরনো পৃথিবীর' বানর, লেমুর প্রভৃতির সিরামের সাথে বিক্রিয়া করালে দেখা যাবে, যে প্রাণীগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্কের নৈকট্য যত বেশি তলানির পরিমাণ তত বেশি হয়। পুর্বোক্ত প্রাণীগুলোর মধ্যে বিক্রিয়ার অনুক্রম হল :

মানুষ –> নরবানর –> পুরোন পৃথিবীর বানর –> লেমুর

অঙ্গসংস্থানবিদদের মতে উল্লিখিত প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক আদিম হচ্ছে লেমুর, আর সবচেয়ে নতুন প্রজাতি হচ্ছে মানুষ। তাই মানুষের ক্ষেত্রে তলানির পরিমাণ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি আর লেমুরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। দেখা যাচ্ছে বিবর্তন যে অনুক্রমে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়েছে রক্তরস বিজ্ঞানের 'অ্যান্টিজেন এন্টিবডি' বিক্রিয়াও সে ধারাবাহিকতাকেই সমর্থন করে।

এখানেই গল্পের কিন্তু শেষ নয়, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া বিবর্তনবাদের সমর্থনগুলো লিপিবদ্ধ করতে গেলে মহাভারত লিখতে হবে। যেমন ধরুন UBX জিনের আবিষ্কারের পর (এডয়ার্ড লুইস এই জিনটি আবিষ্কার করে ১৯৯৫ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন) আমরা জানতে পারছি যে, এই জিনগুলো দিয়ে জীবের শরীরের গঠনের পরিকল্পনা, এবং বিভিন্ন জীবের গঠনের মধ্যে পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই UBX জিনগুলো HOX জিনের অংশ এবং তাদেরকে স্পঞ্জ থেকে শুরু করে ফ্রুট ফ্লাই বা স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর দেহে পাওয়া যায়। তারা 'অন' না 'অফ' হয়ে আছে তার উপর নির্ভর করছে প্রাণীর শরীরের বিভক্তিকরণ থেকে শুর করে পা, এন্টেনা বা পাখার গঠন। এই জিনগুলোর মিউটেশন থেকেই সাপ তার পা হারিয়েছে, মাছের লোব ফিন থেকে হাতের উৎপত্তি ঘটেছে বা মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে চোয়ালের বিবর্তন ঘটেছে। এখান থেকে এখন বিবর্তনের বিভিন্ন বড় বড় ধাপের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব, বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ইতিমধ্যেই এমন অনেক পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং আরও চালিয়ে যাচ্ছেন।

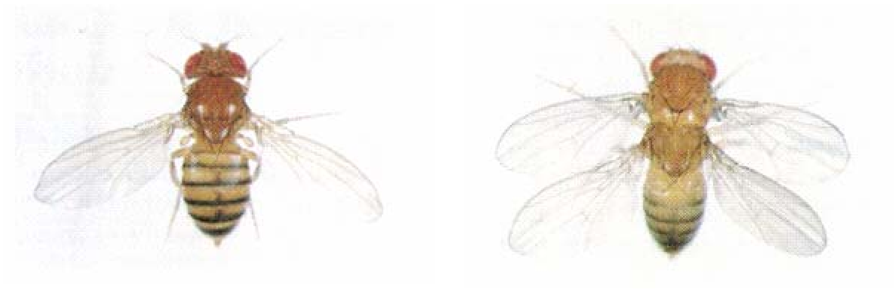

চিত্র : গবেষণাগারে ইউবি একস (UBX) জিনের মধ্যে হোমিওটিক মিউটেশনের সার্থক প্রয়োগঃ দুই পাখা বিশিষ্ট Drosophila melanogaster ফ্লাই থেকে চার পাখা বিশিষ্ট ফ্লাইয়ের উৎপত্তি। (Ref. Evolution and Development, Doglas J. Futuyama, Evolution, Sinauer Associates Inc. p.475)

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ফ্রুট ফ্লাই-এর পা এর সংখ্যা অদল বদল করে তাদের বাহ্যিক গঠন বদলে দিতে পেরেছেন। তারা আরও দেখেছেন ৪০০ মিলিয়ন বছর আগে যে প্রজাতিটি থেকে ছ’ পা ওয়ালা ফ্রুট ফ্লাইগুলো ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে, তাদের দৈহিক কাঠামো একেবারেই ভিন্ন ছিল। তাদের পেটের নীচের দিকে শুরের মত অসংখ্য পা সদৃশ উপাংগ ছিল। হোক্স জিনগুলোর প্রভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে ছয় পায়ে এসে ঠেকে।

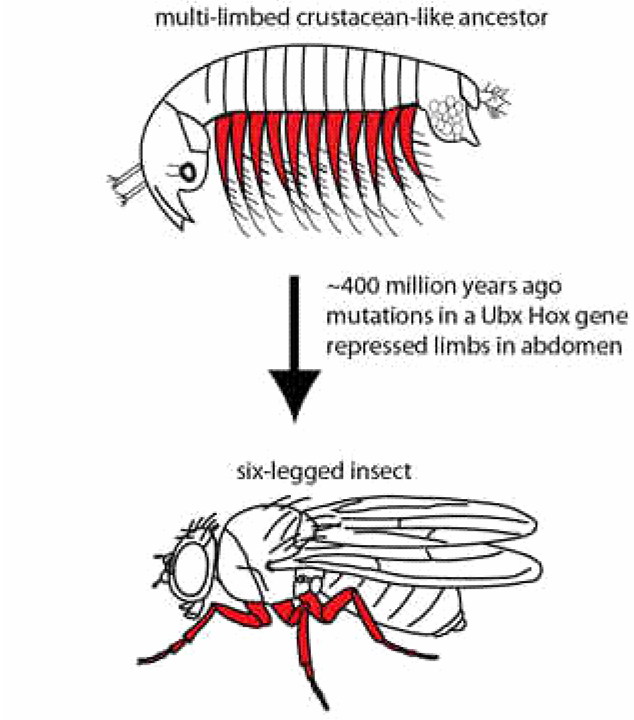

যা হোক, হোক্স জিন আর এধরণের জেনেটিক মেকানিজম সংক্রান্ত গবেষণা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ম্যাক্রোবিবর্তনের সপক্ষে গবেষণাগার থেকেই এমন সমস্ত প্রমাণ হয়তো আমরা পেতে শুরু করব যে ‘ম্যাক্রো-ইভলুশন স্রেফ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে’ - সৃষ্টিবাদীদের এ ধরনের

অভিযোগগুলো সাধারণ মানুষের কাছে নিতান্তই হাস্যকর হয়ে উঠবে।

৩) দু'চারটি আংশিক ফসিল বা হাড়গোড় পেয়েই বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের সপক্ষে বড় বড় সিদ্ধান্ত টানেনঃ

এই ধরণের দাবী করা শুধুমাত্র বিজ্ঞানের সাথে খুব গভীর সম্পর্ক নেই এমন মানুষের পক্ষেই সম্ভব মনে হয়। বিজ্ঞান যদি বারবার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরীক্ষা না করে, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির না করেই দু একটি হাড়গোড় দেখেই বিবর্তনবাদের মত একটি যুগান্তকারী তত্ত্বে পৌঁছে যেতে পারে তাকে কিভাবে বিজ্ঞান বলা যায় তা আমার জানা নেই। বড়ই জানতে ইচ্ছে করে যাঁরা এই ধরণের দাবীগুলো করেন তারা কি সৃষ্টিতত্ত্ববাদী খ্রীষ্টান মৌলবাদী ওয়েব-সাইটগুলো ছাড়া আর কিছু পড়ে দেখেছেন, তাদের কি আদৌ সময় হয়েছে বিবর্তনবাদের উপর লেখা একটাও পাঠ্য বই পড়ে দেখার? এই বইগুলো পড়লে তো চোখের সামনে সম্পুর্ণ ভিন্ন এক চিত্র ফুটে ওঠার কথা ছিলো। তারা দেখতে পেতেন কেমন করে দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন অনুকল্প পড়ে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পর্যাপ্ত পরিমাণে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কম্যুনিটি তাকে গ্রহণযোগ্য বলেই গন্য করছেন না। যে ছবিগুলো বিজ্ঞানের বইয়ে ছাপা হচ্ছে তার পিছনে কত ফসিল রেকর্ড রয়েছে তা কি তারা হিসেব করে দেখেছেন। তার উপর ফসিল রেকর্ডের উপরই তো শুধু নির্ভরশীল নয় আজকের বিবর্তনবাদ, পৃথক পৃথকভাবে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, এমনকি অত্যাধুনিক জিনোমিক্স শাখার গবেষণা থেকে এর পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। চলুন একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক, দু'একটি হাড় গোড়ের উপর ভিত্তি করে নাকি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে এই তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্তগুলো।

মানুষ এবং বনমানুষ বা এপ এর মধ্যবর্তী ফসিলের কথা উল্লেখ করেছিলাম আগের অধ্যায়গুলোতে। মধ্যবর্তী ফসিলের উদাহরণ হিসেবে ৩০-৪০ লক্ষ বছর আগে আমাদের পুর্বপুরুষ *Australopethicus afarensis* এর চেয়ে ভালো আর কি বা হতে পারে! তাদের মুখের আদল তখনও বনমানুষেরই মত, অথচ দুই পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখে গেছে, বনমানুষের চেয়ে বড় কিন্তু আধুনিক মানুষের চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট মস্তিষ্কের আকার! ডারউইন এসব ফসিল পাওয়া যাওয়ার অনেক আগেই ধারণা করেছিলেন যে আফ্রিকার বনমানুষ (গরিলা, শিম্পাঞ্জীর কোন পূর্বপুরুষ) থেকেই মানুষের উৎপত্তি হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে তখনও কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় তা অনুকল্প হিসেবেই থেকে যায়। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষের ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে বুঝতে শুরু করেন যে, এতদিন আমরা যা-ই ভেবে থাকি না কেনো মানুষের প্রজাতি আসলে একটি নয়, বহু মানব প্রজাতির পদচারণায় মুখরিত ছিলো এই পৃথিবী এক সময়। ফসিলবিদেরা বনমানুষ এবং আধুনিক মানুষের মাঝখানের বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিল থেকে ধারণা করতে শুরু করেন যে, প্রায় ৪০-৮০ লক্ষ বছর আগে এই বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। একের পর এক ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে, ডিএনএ-এর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাইমেটদের মধ্যে অন্যরা নয় (ওরাং ওটাং বা গরিলা নয়) শুধু শিম্পাঞ্জীর সাথেই আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। প্রাথমিকভাবে মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং করার কাজ শেষ হয়েছে সেই ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে, সেই সাথে ২০০৫ সালেশিম্পাঞ্জীর জিনোমও পড়ে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। গত দুই বছরে মানুষ, শিম্পাঞ্জী, বনোবো, গরিলা এবং ওরাং ওটাং এর জীনের তুলনামুলক গবেষণা থেকেও দেখা গেছে যে, তাঁদের আবিষ্কারগুলো ফসিলবিদদের আবিষ্কৃত ফসিলগুলোর সাথে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানের জার্ণালগুলো খুঁজলেই এই ধরণের হাজারো রিসার্চ পেপার

পাওয়া সম্ভব। এ তো আর হতে পারে না যে বিজ্ঞানের এতগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত শাখা থেকে পাওয়া পৃথক পৃথক ফলাফল 'ঝড়ে বক পড়া'র মত করে মিলে যাচ্ছে, আর বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা সেই ভন্ড সাধুর মত তার কৃতিত্ব নিয়ে যাচ্ছেন যুগের পর যুগ ধরে! গত ১৭ই মে ২০০৫ সালের 'Nature' জার্ণালে প্রকাশিত গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীরা জিনোম পরীক্ষা করে এখন নিশ্চিত যে মানুষের এবং শিম্পাঞ্জীর পুর্বপুরুষেরা ৬৩-৫৪ লক্ষ বছর আগে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো [১২], যা আবার এখন পর্যন্ত পাওয়া রেকর্ডগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে প্রায় সম্পুর্ণভাবে। এখানে আরেকটি উদাহরণ হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে, ফসিলবিদেরা গত শতকে নিয়ান্ডারথাল মানুষের বহু ফসিল আবিষ্কার করেছেন, তারা আমাদের আধুনিক মানুষের এতোই কাছাকাছি যে প্রথমে তাদেরকে আমাদের নিজেদের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলেই গন্য করা হয়েছিল। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে তর্ক বিতর্ক যেন আর শেষ হচ্ছিল না, অবশেষে ১৯৯৭ এ একদল বিজ্ঞানী ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে এই বিতর্কের অবসান ঘটালেন। তারা ১৮৫৬ সালে পাওয়া সেই নিয়ান্ডারথালের ফসিল থেকে ডিএনএ বের করে প্রমাণ করলেন যে, ফসিলটির বয়স আসলেই প্রায় ৩০,০০০ বছর এবং এর সাথে মানুষের আনেক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকলেও তারা আসলে আমাদের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় [১৩]। এ তো গেলো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ক্রস পরীক্ষণের ব্যাপারটি, এবার চলুন দেখা যাক ফসিল রেকর্ডগুলো কি ধরণের তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।

৭০ দশকের প্রথম দিকে ইথিওপিয়া ও তানজেনিয়ায় *Australopethicus afarensis* (আফার অঞ্চল থেকে পাওয়া দক্ষিণের বনমানুষ *)* প্রজাতির আংশিক ফসিল পাওয়া যায়, এর মধ্যে ছিল হাটুর জয়েন্ট এবং পায়ের হাড়ের উপরের অংশ যেখান থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে এরা দুই পায়ের উপর ভর করে হাটতে পারতো। কিন্তু তারপরের পাঁচ বছরে আরও একই ধরণের প্রজাতির বহু ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে যার মধ্যে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পান সেই বিখ্যাত লুসির প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কালটি। শুধু তো তাই নয় তার সাথে আরও পাওয়া গেছে ১৩ টি *Australopethicus afarensis* এর ফসিল। অনেকেই মনে করেন যে এরা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে একসাথে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এই সবগুলো ফসিলেরই বয়স ২৮-৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে [১৩]। তাঞ্জেনিয়ার একটি অঞ্চলে আরও অনেকগুলো এই প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে যাদের বয়স ৩৫-৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে। আরও অদ্ভুত যে জিনিষটি পাওয়া গেছে তা হল এই অঞ্চলে একই সময়ে ঘটা এক অগ্নুৎপাতের লাভার মধ্যে সংরক্ষিত এই প্রজাতির দু'টি প্রাণীর পায়ের ছাপ। এছাড়াও ৩০-৫০ লক্ষ বছরের এই প্রজাতির আরও বেশ কিছু আংশিক ফসিল পাওয়া গেছে আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায়। প্রায় ২০ লক্ষ বছরের বেশি সময় ধরে বিবর্তিত হতে থাকা এই বিভিন্ন মাত্রার ফসিলগুলোর বিবর্তন দেখলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে কি করে মানুষের আদি পূর্বপুরুষেরা ক্রমশঃ বনমানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি করে মানুষের মত বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে শুরু করেছিলো। মানুষের বিবর্তনের উপর লেখা যে কোন ভালো বৈজ্ঞানিক বই খুললেই এর বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। আর এরকম একটি দু'টি প্রজাতির মানুষের পূর্বপুরুষের তো নয়, অনেকগুলো প্রজাতির ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত, যা নিয়ে মানুষের বিবর্তন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা খুব সহজে যে কোন অনুকল্পকে সঠিক বলে গ্রহণ করেন না, পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যে অনুকল্প অনুকল্পই থেকে যায়, তা আর তত্ত্বে রূপ নেয় না, তার প্রমাণ স্বরূপ আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আফ্রিকার চাদ নামক দেশটিতে থেকে মানুষের পুর্বপুরুষের একটি সম্পুর্ণ মাথার খুলি পাওয়া গেছে যার বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০-৭০ লক্ষ বছর। খুব সম্প্রতি কেনিয়া এবং ইথিওপিয়ায় প্রায় একই সময়ের আরও দু'টি ফসিলের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও এদেরকে সবচেয়ে পুরোনো মানুষের পুর্বপুরুষের ফসিল বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ কারণ তাদের মতে কোন সিধান্তে পৌছানোর মত পর্যাপ্ত পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। লন্ডনের ন্যাচারাল

হিস্ট্রি মিউজিয়ামের মানুষের উৎপত্তি বিভাগের প্রধাণ Chris Stringer এবং প্রাক্তন প্রধান Peter Andrews-এর লেখা খুব সাম্প্রতিক (২০০৫ সালে প্রকাশিত) বই The Complete World of Human Evolution এ তারা খুব পরিষ্কারভাবেই বলছেন যে, এ সম্পর্কে কোন শেষ সিধান্তে আসা এখনও সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে জুরির রায় এখনও প্রকাশ করার সময় হয়নি [১৪]।

এখন, যাঁরা বলেন দু'একটা হাড়গোড় থেকে বিজ্ঞানীরা এধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছান তাঁদের কি উত্তর

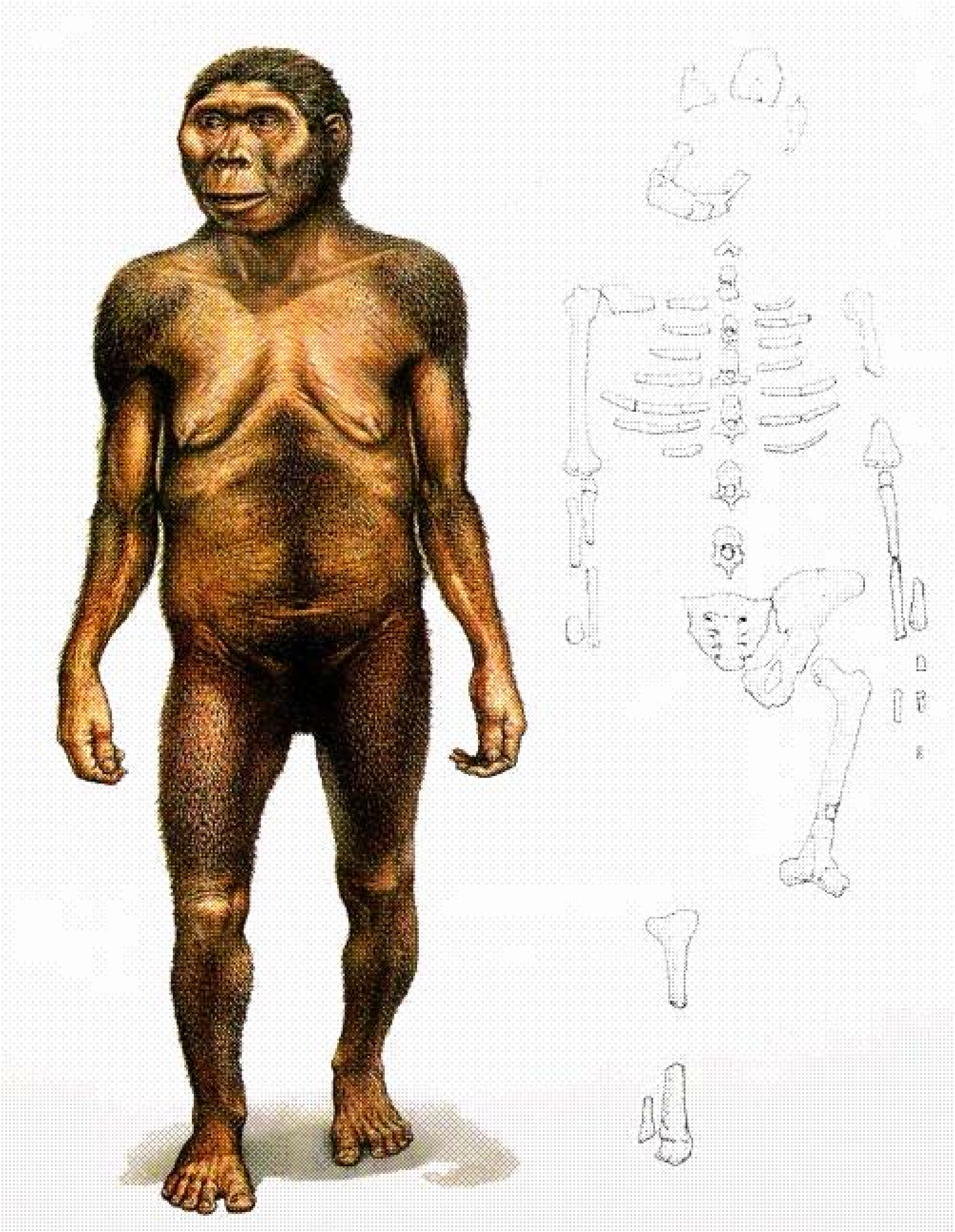

চিত্র ১০.১ : লুসির ফসিল এবং তা থেকে আঁকা সম্ভাব্য প্রতিকৃতি (১৪)

দেওয়া উচিত আসলেই বুঝতে পারি না। 'আরেকটু ধৈর্য নিয়ে পড়ে দেখুন' বা 'বই পড়ুন' ধরণের উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কি বা করার থাকতে পারে এখানে। এই ধরণের বিস্তারিত অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বিজ্ঞানীরা ছবি আঁকেন বিভিন্ন প্রজাতির, মনগড়া ছবি এঁকে দেওয়ার অবকাশ কোথায় এখানে? উপরের *Australopethicus afarensis*-এর ছবিটি আঁকা হয়েছে আগে বলা সবগুলো সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে - এর পরে কেউ যদি বলেন আমরা তো ৩০-৪০ লক্ষ বছর আগে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম না, কিংবা এটি হচ্ছে বিজ্ঞানীদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, বা দু'একটি হাড় গোড়ের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌছে যাচ্ছেন তখন এসব লোকের অজ্ঞতার পরিমান দেখে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কি বা করা যায়?

৪) একবার বনমানুষ থেকে যদি মানুষের বিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে এখন কেনো তা আর হচ্ছে না? অর্থাৎ, একই রকম বিবর্তন কেনো বারবার ঘটতে দেখা যায় না?

অনেক বিবর্তনই মিউটেশনের মত আকস্মিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। আবার শুধু মিউটেশন বা জেনেটিক রিকম্বিনেশনের মত ব্যাপারগুলো তো ঘটলেই হবে না, তাকে আবার নির্দিষ্ট কোন সময়ের পরিবেশে সেই জীবকে টিকে থাকার জন্য বাড়তি সুবিধা যোগাতে হবে যার ফলে তা সমস্ত জিন পুল বা জনসমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। যেমন ধরুন, প্রায় ৬০-৮০ লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে যে মিউটেশন বা পরিব্যক্তিগুলো ঘটেছিল এবং তার ফলে সেই সময়ের পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যেভাবে বিবর্তন হয়েছিলো তা আবার একইভাবে ঘটা এবং তার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিকতাসহ অন্যান্য সবগুলো ফ্যাক্টরের সংযোগ বা সমন্বয় আবার একই রকমভাবে হওয়া প্রায় অসম্ভব। বিজ্ঞানী জে. গুলড তার Wonderful Life বই তে বলেছিলেন যে, বিবর্তনের টেপটি যদি রিওয়াইন্ড করে আবার নতুন করে চালানো হয় তাহলে ফলাফল কখনই এক হবে না[১৫], এর কারণ আছে। বিবর্তন অনেকাংশেই একটি ইতিহাস-আশ্রয়ী বিজ্ঞান। ইতিহাসকে খুব সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু সব সময় আগেভাগেই তার নিঁখুতভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। অনেকেই জানেন, বিজ্ঞানী ল্যাপ্লাস সেই আঠারো শতকের শেষ দিকে আস্থার সাথে ডিটারমিনিজম বা নিশ্চয়তাবাদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন; তিনি বলেছিলেন, প্রতিটি কণার অবস্থান ও গতি সংক্রান্ত তথ্য যদি জানা যায়, তবে ভবিষ্যতের দশা সম্বন্ধে আগেভাগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে। কিন্তু বৈশ্বিক জটিলতার প্রকৃতি (nature of universal complexity) তাঁর সে উচ্চাভিলাসী স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়। ইতিহাসের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অনাকাংক্ষিত বিশৃংখলা আর অভূতপূর্ব জটিলতা যার ফলশ্রুতিতে প্রতি মিনিটেই জন্ম নেয় নানা ধরনের নাটকীয় অনিশ্চয়তা। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর প্রকৃতি পরিবেশ যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে তার চিহ্ন আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই প্রকৃতির এবং জীবের বিবর্তনের ইতিহাসে, এটি সত্য, কিন্তু এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলো যদি অন্যভাবে ঘটতো তাহলে জীবের বিবর্তনের ধারাও যে অন্যরকম হত তাতে কোন সন্দেহই নেই। মানুষের উৎপত্তির ব্যাপারটাই ধরা যাক। এটি সৌভাগ্যপ্রসূত হাজার খানেক ঘটনার সমন্বয় ছাড়া কখনই ঘটতে পারতো না। ঘটনাগুলো যদি অন্যরকম ভাবে ঘটতো, তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে কোন 'মানবীয় সত্ত্বা'র উন্মেষ ঘটতো না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা পর্যালোচনা করা যাক [১৬]:

(ক) আমাদের পূর্বসূরী সেই আদিম বহুকোষী জীবগুলো যদি ৫৩ কোটি বছর আগে ক্যাম্বরিয়ান

বিস্ফোরণের সময় উত্তপ্ততা আর তেজস্ক্রিয়তাসহ নানা উৎপাত সহ্য করে টিকে না থাকতো, তবে হয়তো পরবর্তীতে কোন মেরুদন্ডী প্রাণীর জন্ম হত না।

(খ) সেই লোব ফিন বিশিষ্ট মাছগুলো যারা দেহের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর নিজস্ব ওজনকে বহন করার ক্ষমতা রাখে, সেগুলোর বিবর্তন এবং বিকাশ না ঘটলে মেরুদন্ডী প্রাণীগুলোর ডাঙ্গায় উঠে আসা সম্ভব হতো না। আবার সেই সময়ে যদি তাপমাত্রার ওঠানামার এবং বরফ যুগ শুরু হওয়ার ফলে পানির উচ্চতা কমে না যেত তাহলে হয়তো ডাঙ্গার প্রাণীগুলোর বিকাশ এভাবে ঘটতে পারতো না।

(গ) সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে এক বিশাল উল্কাপিন্ড পৃথিবীতে আছড়ে পরে বিশালাকার ডায়নোসরগুলোর অবলুপ্তির কারণ না ঘটাতো, তাহলে হয়ত সেই সময়ের নগন্য স্তন্যপায়ী জীবগুলো আর বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেত না, বরং ডায়নোসরদের প্রবল প্রতাপের সামনে কুনো ব্যাং হয়ে রইতো।

(ঘ) যদি আফ্রিকার গহীন অরণ্যে বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগে আমাদের পুর্বপুরুষের দেহের ভিতরে পরিবর্তন না ঘটতো এবং সেই পরিবর্তনগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা তখনকার সেই পরিবেশগত সুবিধাগুলো না পেত, তাহলে হয়তো তারা দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াবার আর চলবার মত সুগঠিত হতে পারত না, আজকে মানুষের বিবর্তনও ঘটতো না, আমরাও আজকে আর এখানে থাকতাম না। কাজেই দেখা যাছে পুরো মানব বিবর্তনটিই দাড়িয়ে আছে অনেকগুলো আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়ে। বিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়াটা আবার প্রথম থেকে চালানো গেলেও সে 'দৈবাৎ ঘটে যাওয়া' ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটবেই, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেনা।

আবার কখনও কখনও একই রকমের বিবর্তন যে সম্পুর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন জীবে ঘটে না তাও কিন্তু নয়। এর ফলে দুইটি জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত মিল দেখা গেলেও তাদের বিবর্তন কিন্তু ঘটেছে সম্পূর্ণভাবে দু'টো আলাদা প্রক্রিয়ায়। প্রকৃতিতে এরকম সমান্তরাল বিবর্তনের উদাহরণ রয়েছে অনেক। যেমন ধরুন, মানুষ এবং মলাস্কের চোখের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও (ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন অধ্যায় দেখুন) তারা যেহেতু সম্পুর্ণ আলাদাভাবে বিবর্তিত হয়েছে তাদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্যও রয়েছে অনেক।

৫) বানর থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটলে এখনও বানরগুলো পৃথিবীতে রয়ে গেলো কি করে?

আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন অনেককেই এ প্রশ্নটি করতে শুনেছি। ছোট্ট এ প্রশ্ন থেকেই আঁচ করা যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তন সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিমাপটুকু। যে ভুলটি প্রায়শই তারা করে থাকেন, তা হল, তারা বোধ হয় ভাবেন যে জঙ্গলে গাছের ডালে বা চিড়িয়াখানার খাঁচার রড ধরে ঝুলে থাকা বাঁদর-শিম্পাঞ্জী গুলো থেকেই বুঝি মানুষের উদ্ভব হয়েছে। আসলে তো ব্যাপারটা তা নয়। বিবর্তন তত্ত্ব বলছে মানুষ আর পৃথিবীর বুকে চড়ে বেড়ানো মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষগুলো অনেক অনেককাল আগে একই পূর্বপুরুষ (common ancestor) হতে উদ্ভুত হয়ে বিবর্তিত হয়ে আলাদা আলাদা প্রজাতির ধারা (lineage) তৈরি করেছে। এর মানে কিন্তু এই নয় পৃথিবীতে বিদ্যমান সব শিম্পাঞ্জীগুলো মানুষ হয়ে যাবে বা সব মানুষগুলো শিম্পাঞ্জী হয়ে যাবে। প্রাণের বিকাশ এবং বিবর্তনকে একটা বিশাল গাছের সাথে

তুলনা করা যায়। একই পূর্বপূরুষ থেকে উদ্ভুত হয়ে বিবর্তনের ওই গাছটির (জাতিজনি বৃক্ষ) বিভিন্ন ডাল পালা তৈরি হয়েছে (উপরের ছবি দ্রষ্টব্য)। এর কোন ডালে হয়তো শিম্পাঞ্জীর অবস্থান, কোন ডালে হয়ত গরিলা আবার কোন ডালে হয়ত মানুষ। অর্থাৎ, একসময় তাদের সবার এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিলো, ১.৪ কোটি বছর আগে তাদের থেকে একটি অংশ বিবর্তিত হয়ে ওরাং ওটাং প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। তখন,

যে কারণেই হোক, এই পূর্বপুরুষের বাকি জনপুঞ্জ নতুন প্রজাতি ওরাং ওটাং এর থেকে প্রজননগতভাবে আলাদা হয়ে যায় এবং তার ফলে এই দুই প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে শুরু করে তাদের নিজস্ব ধারায়। আবার প্রায় ৯০ লক্ষ বছর আগে সেই মুল প্রজাতির জনপুঞ্জ থেকে আরেকটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং পরবর্তিতে ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়ে গরিলা প্রজাতির উৎপত্তি ঘটায়। একইভাবে দেখা যায় যে, ৬০ লক্ষ বছর আগে এই সাধারণ পুর্বপুরুষের অংশটি থেকে ভাগ হয়ে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির বিবর্তন ঘটে। তারপর এই দু'টো প্রজাতি প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন থেকেই

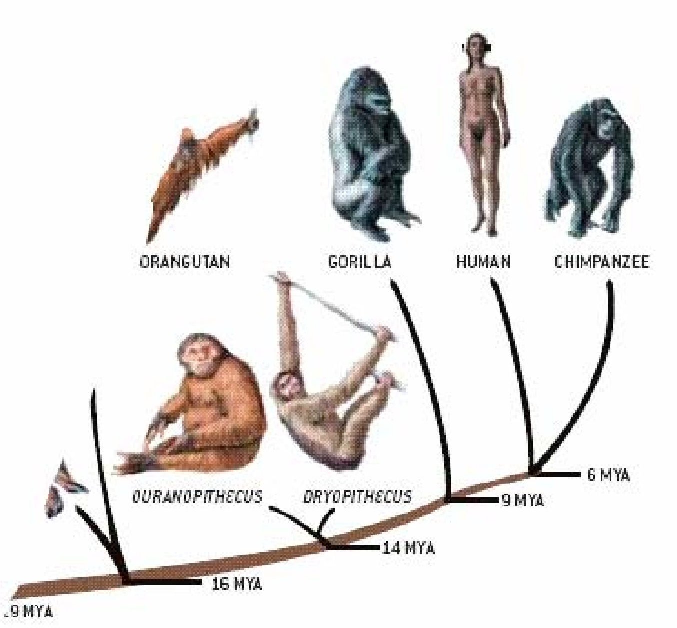

চিত্রঃ ১০.২ : সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিভিন্ন সময়ে মানুষ, শিম্পাঞ্জী, গরিলা এবং ওরাংওটাং এর বিবর্তন ।

একদিকে স্বতন্ত্র গতিতে এবং নিয়মে মানুষের প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে শুরু করে, আর ওদিকে আলাদা হয়ে যাওয়া শিম্পাঞ্জীর সেই প্রজাতিটি ভিন্ন গতিতে বিবর্তিত হতে হতে আজকের শিম্পাঞ্জীতে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং কোন এক সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে দু'টো প্রজাতির উৎপত্তি ঘটলেই যে তাদের একটিকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে বা এক প্রজাতির সবাইকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম প্রকৃতিতে নেই। বিবর্তন প্রায়শঃই কাজ করে ঝোপের মত, ক্রমাগতভাবে একই দিকে উপরে উঠতে থাকা মইয়ের মত নয়।

৬) বিবর্তন তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে লংঘন করেঃ

এটি যারা বলেন তাদের তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) এবং এর সূত্রগুলো সম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণা নেই। তাপগতিবিদ্যার তিনটি সুত্র আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রটি বলছে : 'তাপ কখনও নিজে

থেকে শীতল বস্তু হতে গরম বস্তুতে যেতে পারে না।' সূত্রটিকে অনেক সময় এভাবেও বলা হয় : 'একটি বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কখনও কমতে পারে না।'

এনট্রপি ব্যাপারটিকে অনেকসময় সাদামাটাভাবে বিশৃঙ্খলা বা disorder হিসেবে দেখানো হয়। এনট্রপি কমার অর্থ হচ্ছে সাদামাটা ভাবে বিশৃংখলা কমা। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র বলছে বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কমতে পারবে না, বাড়তে হবে।

বোঝা যাচ্ছে যে, তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি যে ভাবে বলা হচ্ছে তা শুধু বদ্ধ সিস্টেমের জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের বাসার রেফ্রিজেটরের উদাহরণটি হাজির করি। আমরা সবাই জানি যে, রেফ্রিজেটরে তাপকে 'উল্টো দিকে' চালিত করা হয়, অর্থাৎ, শীতল অবস্থা থেকে গরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়, ফলে সেখানে পানি জমে বরফ হতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে রেফ্রিজেটরের ভিতরে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু তাপকে এই 'উল্টো দিকে' চালিত করার জন্য রেফ্রিজেটরকে বাড়তি কিছু কাজ করতে হয়। কাজ করবার শক্তিটুকু রেফ্রিজেটরটি কোথা হতে পায়? রেফ্রিজেরটের পেছনে লাগানো মোটর আর কিছু জ্বালানী এই শক্তিটুকু সরবরাহ করে। কিন্তু এই শক্তিটুকু সরবরাহ করতে গিয়ে তারা ঘরের এনট্রপিকে বাড়িয়ে তোলে। এবারে খাতা কলম নিয়ে হিসেব কষলে দেখা যাবে পানিকে বরফ করে রেফ্রিজেটর তার ভেতরে এনট্রপি যত না কমিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়িয়ে তুলেছে ঘরের এনট্রপি। কাজেই যোগ-বিয়োগ শেষ হলে দেখা যাবে এনট্রপির নেট বৃদ্ধি ঘটেছে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শুধুমাত্র রেফ্রিজেটরের ভিতরটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারে, এনট্রপি তো কমে গেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরো সিসটেম (ওপেন সিস্টেম) গোনায় ধরলে দেখবে যে, এনট্রপি আসলে কমেনি, বরং বেড়েছে।

বিবর্তনের ব্যাপারটাও তেমনি। সূর্য আমাদের এ পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত শক্তির যোগান দিয়ে চলেছে। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবদেহে কোষের বৃদ্ধি ঘটে, এবং কালের পরিক্রমায় বিবর্তনও ঘটে। শুধুমাত্র জীবদেহের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে যে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু ঠিকমত হিসেব-নিকেশ করলে তবেই বোঝা যবে যে, এই 'আপাতঃ এনট্রপি' কমাতে গিয়ে শক্তির যোগানটা পড়ছে অনেক বেশী। কাজেই এনট্রপির আসলে নীট বৃদ্ধিই ঘটছে।

সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থার উত্তরণকে যারা 'এনট্রপি কমার' অজুহাত তুলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের লংঘন ভাবেন তারাও ভুল করেন। প্রকৃতিতে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উত্তরণের উদাহরণের অভাব নেই। এমনকি জড়জগতেও এধরনের 'আপাতঃ এনট্রপি' কমার উদাহরণ রয়েছে বিস্তর। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, লবনের মধ্যে কেলাস তৈরী, কিংবা পাথুরে জায়গায় পানির ঝাপটায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে বিরল নয়। কোনটির ক্ষেত্রেই তাপগতির সূত্র ব্যহত হয়নি। কাজেই কালের পরিক্রমায় সরল জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে জটিল জীবের অভ্যুদয় কোন অসম্ভব ঘটনা নয়, নয় তাপগতিবিদ্যার লংঘন।

৭) বিবর্তনের সাথে সাথে স্কুল কলেজের বিজ্ঞানের পাঠ্যসুচীতে ধর্মীয় সৃষ্টতত্ত্ব বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন পড়ানো উচিত।

অনেকেই নিরপেক্ষতার খাতিরে এ ধরনের যুক্তিকে 'গ্রহনযোগ্য' বলে মনে করেন। সত্যি তো, বিবর্তনবাদের পাশাপাশি সৃষ্টি তত্ত্ব স্কুল কলেজের বিজ্ঞানের ক্লাশগুলোতে পড়ালে অসুবিধাটা কি? একটু

চিন্তা করলেই এ ধরনের যুক্তির নানা অসারতা ধরা পড়ে। আমাদের সমাজে ছড়িয়ে আছে হাজারো লোক কথা, উপকথা, কুসংস্কার আর রূপকথা। সবকিছুকেই কি বিজ্ঞানের ক্লাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়? নাকি উচিৎ? বিজ্ঞানের সংজ্ঞাই হচ্ছে - 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ জ্ঞান।' বিজ্ঞানীরা বলেন, অলৌকিক কিংবা অপার্থিব (supernatural) বিষয়গুলো বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ন, কারণ ওগুলো পরীক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায় না। ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা কিংবা কোন বুদ্ধিমান সত্তা সত্যই এ মহাবিশ্ব বানিয়েছিলেন কিনা এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা কিংবা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া অলৌকিক কারণ খুঁজতে চাইলে সব কিছুতেই অলৌকিক কারণ খুঁজে ফেরা সম্ভব। গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আকর্ষণ বলকে মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে ব্যাখ্যা না করে তার পেছনে কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার কারসাজি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, ঠিক যেমনি ভাবে বৃষ্টিপাতেরর কারণকে জলচক্র (water cycle) দিয়ে ব্যাখ্যা না করে কোন অশরীরী সত্তার কাজ বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যাকে কি 'বৈজ্ঞানিক' বলা যাবে নাকি বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে?

শুধু বিজ্ঞান কেন আমরা দৈনিন্দিন জীবনের ঘটনাবলিকে প্রাকৃতিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করি। কোন উড়োজাহাজ দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে ভূপাতিত হলে পুলিশ এবং গোয়েন্দারা এর পেছনে তার পেছনে যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা, কিংবা মিসাইলের কোন আঘাত লেগেছিল কিনা, কিংবা বিমানের ভিতরে কোন সন্ত্রাসবাদী বোমা বহন করছিল কিনা, এধরনের বিভিন্ন পার্থিব কারণই অনুসন্ধান করেন, অলৌকিক কিংবা অপার্থিব কারণ নয়। বাসায় ডাকাতি হলে আমরা চোর ডাকাতদের অভিযুক্ত করেই থানায় রিপোর্ট করি, কোন অশরীরী সত্ত্বাকে অভযুক্ত করে নয়। ডগলাস ফুটুইমা বিবর্তনবাদের উপর সবার্ধিক বিক্রিত পাঠ্যপুস্তক 'Evolution' -এ সরাসরি বলেছেন [১]:

> 'যেহেতু অপার্থিব বা অলৌকিক অনুকল্পগুলো বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষণ যোগ্য নয়, সেহেতু এ নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে পারে না। তার মানে এই যে, এ ধরনের বিষয়গুলো বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য নয়।'

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পকে যারা স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চান, তাদের দাবী যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তা দেখিয়ে দশম অধ্যায়ে (ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প মুলতঃ কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণারই অংশ নয়, কারণ কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালেই তাদের কোন গবেষণার প্রতিফলন দেখা যায় না। রিচার্ড ডকিন্স এবং জেরী কয়েন ২০০৫ সালে সেপটেম্বর মাসে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত 'One side can be wrong' প্রবন্ধে তাই লিখেছেন [১৭]:

> 'আইডি যদি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে এ নিয়ে গবেষণার প্রতিফলণ আমরা দেখতে পেতাম। আমরা তেমন কোন কিছুই এখনো দেখি নাই। এমন নয় যে বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলো আই ডি সংক্রান্ত গবেষণা ছাপতে চায় না। আসলে আই ডি নিয়ে ছাপার মত কোন গবেষণারই অস্তিত্ব নেই। আইডির প্রবক্তারাও এটি বোঝেন। তাই তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে পাশ কাটিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে আর সুচতুর সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন।'

৮) বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক থেকে বোঝা যায় যে, বিবর্তনবাদ আসলে ভুল, ডারউইনের তত্ত্বের কোন ভিত্তি নেই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালে বিবর্তনের বিরোধিতা করা হয় না। বিজ্ঞানীরা বিবর্তন কিভাবে ঘটছে অর্থাৎ বিবর্তনের বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিবর্তনবাদের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ 'বিবর্তন আদৌ ঘটছে কিনা' তা নিয়ে একবারও সন্দেহ প্রকাশ করেন না। কারণ বিবর্তনের বাস্তবতা অনেক আগেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এখন জার্নালগুলোতে বিতর্ক চলেছে বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে, কিংবা বিবর্তন ঘটার হার নিয়ে কিংবা প্রজাতির উদ্ভবের পেছনে থাকা কোন কারিগরী বিষয় নিয়ে। এ ধরনের সুস্থ বিতর্ক বিবর্তন কেন, বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই বিদ্যমান। বিজ্ঞান যে অনবরত প্রশ্ন করে, চোখ বন্ধ করে কিছুই মেনে নেয় না, নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে পুরনোকে ঝালাই করে এগিয়ে চলে এটা বিজ্ঞানের শক্তিশালী দিক, একে খারাপ প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অথচ সৃষ্টিবাদীরা বিজ্ঞানের এই শক্তিশালী দিকটি বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করেন। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিফেন জে গুল্ড যখন তার বিবর্তনের 'punctuated-equilibrium' এর মডেলটি উপস্থাপন করলেন, তখন সৃষ্টিবাদীরা তাদের বিভিন্ন ওয়েব সাইটে গুল্ডের রচনার বিভিন্ন অংশ লিপিবদ্ধ করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই বিবর্তনের মত 'বিতর্কিত' বিষয়ে নিয়ে একমত নন। অথচ বাস্তবতা কিন্তু ঠিক উল্টো। স্টিফেন জে গুল্ড সারা জীবন ধরেই বিবর্তনবাদের পক্ষেই প্রচার চালিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি করতে বিবর্তন বিষয়ে বহু 'জনপ্রিয় ধারার' প্রবন্ধও লিখেছেন। অথচ সৃষ্টিবাদীরা অসচেতন জনগণের মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যেন মনে হয় গুল্ড তার নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে পুরো বিবর্তনকেই অস্বীকার করছেন।

আর 'অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই বিবর্তন তত্ত্বকে অস্বীকার করেন'- এরকম একটা ধারণা সৃষ্টিবাদীরা জনগণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট হলেও ব্যাপারটা কিন্তু আসলে ডাহা মিথ্যা। ১৯৯৫ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের মধ্যে চালানো জরিপে (Gallup poll, 1995) দেখা যায় এদের মধ্যে মাত্র ৫% সৃষ্টিবাদী, বাকি সবারই আস্থা আছে বিবর্তন তত্ত্বে। আর যারা জীববিজ্ঞান এবং প্রাণের উৎস নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মধ্যে তো ইদানিংকালে সৃষ্টিবাদীদের খুঁজে পাওয়াই ভার। ৪,৮০,০০০ জন জীববিজ্ঞানীদের উপর চালানো জরিপে মাত্র ৭০০ জন জন সৃষ্টিতাত্ত্বিক পাওয়া গেছে, শতকরা হিসেবে যা ০.১৫ এরও কম [১৮]। কিন্তু এদের মধ্যে আবার অনেকেই প্রাণের প্রাথমিক সৃষ্টি কোন এক সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে হয়েছে মনে করলেও তারপর যে প্রাণের বিবর্তন ঘটছে প্রাকৃতিক নিয়মেই তা মেনে নেন। এ জরিপের ফল শুধু আমেরিকার ভেতর থেকেই উঠে এসেছে, যে দেশটি আক্ষরিক অর্থেই 'সৃষ্টিবাদীদের আখড়া' হিসেবে পরিচিত এবং রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে অনেক বেশী রক্ষণশীল। এদিক দিয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল অবস্থানে থাকা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন সৃষ্টিবাদী বিজ্ঞানী নেই বললেই চলে।

বহু বৈজ্ঞানিক সংগঠন বিবর্তনের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণকে এতই জোরালো বলে মনে করেন যে, বিবর্তনের সমর্থনে তারা নিজস্ব statement পর্যন্ত প্রকাশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত National Academy of Science এর মত প্রথিতযশাঃ সংগঠন ১৯৯৯ সালে বিবর্তনের স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য দিয়ে একটি ওয়েবসাইট পর্যন্ত প্রকাশ করেছে। ১৯৮৬ সালে লুজিয়ানা ট্রায়ালে

বাহাত্তর জন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী সুপ্রিম কোর্টে বিবর্তনের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন প্রদান করেছিলেন।

জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, জিনোমিক্স বা আণবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যের বিরোধিতা করছে না; আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি যে ডারউইনের পরে গত দেরশো বছরের কিভাবে বিবর্তন তত্ত্ব পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হয়েছে। জেনেটিক্সের বিভিন্ন শাখার গবেষণা যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তাতে আশা করা যায় আমরা আচিরেই আরও অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর পেতে সক্ষম হব। আর বিজ্ঞানীরা সে লক্ষ্যেই নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

তথ্যসুত্রঃ

১. Futuyma DJ, 2005, Evolution, pg.523, Sinauer Associates, INC, MA, USA

২. Gould SJ, 1994, Evolution as Fact and Theory.
http://www.stephenjaygould.org/library/gould-and-theory.htm

৩. Dawkins R, 2004, The Ancestor's Tale, A pilgrimage to the dawn of evolution, Houghton Miffin Company, Boston, New york, p 86.

৪. Futuyma, DJ, 2005, Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA, p 76.

৫. Raymond S, 2001, The Origin of Whales and the Power of Independent Evidence, TalkOrigin website. http://www.talkorigins.org/features/whales/

৬. Gingerich PD, 2005 . Cetacea. In K. D. Rose and J. D. Archibald (eds.), Placental mammals: origin, timing, and relationships of the major extant clades, Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 234-252. http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDFfiles/PDG432_rosearch_cetacea_opt.pdf

৭. Gingerich PD, Research on the Origin and Early Evolution of Whales (cetacea), http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

৮. Gingerich PD, 2003, The Land to Sea Transition in early Whales, Paleobiology, 29(3), pp.429-454
http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

৯. Was Darwin Wrong, 2004, National Geographic, November issue.

১০. New Genome Comaprison Finds chimps, humans very similar at DNA level, 2005, NII/National Human Genome Reserach Institute, Originally published in journal 'Nature', September 1, 2005. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm

১১. Benton M, 2001, Evidence of Evolutionary Transitions. Originally published in American Institute of Biological Sciences.
http://www.actionbioscience.org/evolution/benton2.html

১২. Human and chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, 2006, Broad Institute of MIT and Harvard, Originally published in Nature Online, http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm

১৩. Stringer, C. and Andrews, P , 2005, The Complete World of Human Evolution, Thames and hudson Ltd, London, pp 178-180.

১৪. Stringer, C. and Andrews, P , 2005, The Complete World of Human Evolution, Thames and hudson Ltd, London, pp 117-118.

১৫. Interview with Futuyma D, 2004, Evolution in action Natural Selection: How Evolution Works, An ActionBioscience.org original interview, http://www.actionbioscience.org/evolution/futuyma.html

১৬. Gould, SJ, 1994, The evolution of life on earth, Scientific American, October issue.

১৭. Dawkins R and Coyne J, 2005, One Side Can be Wrong, Guardian.

১৮. CA111: Scientists reject evolution?, 2006, Talk Origin Archive, http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA111.html.

রঙীন প্লেট দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। }